আলাপচারিতায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

আপনার কাজের পরিধি বিস্তৃত। আমি কেবল শিশু-কিশোরসাহিত্যের ক্ষেত্রেই আমার জিজ্ঞাসা সীমিত রাখব। আচ্ছা, শিশুসাহিত্য এবং কিশোরসাহিত্যের মধ্যে লক্ষণগত কোনো পার্থক্য আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

যদি তুমি একেবারে নিখুঁত করে ভাবতে চাও, তফাৎ তো আছেই। শিশুসাহিত্য বলতে সাধারণত যেটা বোঝানো হয়, সেটা বোধহয় পাঁচ থেকে আট বছরের ছোটদের জন্য, আর তারপর নয় থেকে ষোলো বছর কৈশোর, এমনই কোথাও যেন পড়েছিলাম। কিশোরসাহিত্যে এমন কিছুও আমরা লিখতে পারি যা শিশুসাহিত্যে সম্ভব হয় না। যেমন 'গরিলার চোখ'। বইটা শিশুসাহিত্যের জন্য পুরস্কার পেয়েছে, কিন্তু ওটা তো কিশোরসাহিত্য। ঠিক শিশুদের জন্য নয়।

'গরিলার চোখ'- এর কেন্দ্রীয় চরিত্রটিই তো কিশোর

তাই তো।

আপনার 'পাখির খাতা'?

ওটা শিশু, কিশোর সকলেই বোধহয় পড়তে পারে।

আপনি নিজে যখন লেখেন তখন শিশুদের জন্য লিখতে চলেছি বা কিশোরদের জন্য এই গল্পটা লিখছি, এরকম পৃথকীকরণ কি ভেবে নেন?

একেবারেই না। কখনোই নয়। কাদের জন্য লিখছি তা ভাবি না। আমার মনের মধ্যে থেকে আমি যা পাই তাই লিখি। ওরকম হিসেব করে এটা এই বয়সের বা এটা ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য, লেখার কথা মনে আসে না।

আচ্ছা

যেমন, 'শাদা ঘোড়া' বেরোবার পর আমাকে একজন একটা পোস্টকার্ড লিখেছিলেন। যেহেতু অন্য কারণে আমার কাছে রোজই হাজার হাজার চিঠি আসে, সাড়ে তিন থেকে চার হাজার চিঠি রোজ, তাই আমার অভ্যেস হয়ে গেছিল কাউকে উত্তর না দেবার। কারণ একজনকে দিলে অন্য জনের প্রতি অবিচার করা হবে। রটে গেল, আমার কাছে চিঠি পৌঁছয় কিনা জানা যায় না, কারোর চিঠি পড়লাম কিনা তাও জানা যায় না। এটা আমার পক্ষে খুব দুঃখের, তাও মেনে নিয়েছিলাম। এত চিঠির উত্তর দিতে গেলে কী করে আর নিজের কাজ করব!
ওরই মধ্যে একটা চিঠি উত্তর দেবার জন্য রেখে দিয়েছিলাম মনে আছে। তিনি লিখেছিলেন – " 'শাদা ঘোড়া' আমি আর আমার নাতনি একসঙ্গে পড়লাম। একজনের বয়স আশি আর একজনের বয়স আট। দুজনেই মুগ্ধ

হয়ে আবার পড়লাম। আপনি লিখুন, লিখুন, কেবলই লিখুন। সরস্বতী আপনার কলমে ভর করেছে। আহা, এরকম লেখা কতকাল পড়িনি! " চিঠিটা হাজার চিঠির ভিড়ে আর খুঁজে পাইনি। 'শাদা ঘোড়া' সম্পর্কে তারও আগে পাই শঙ্খ ঘোষের চিঠি। সেই চিঠিটা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। আমার ঠিকানা ছিল না ওঁর কাছে, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন চারজনই পড়েছেন – উনি, প্রতিমাদি, মিঠি, টিয়া। কিন্তু " 'শাদা ঘোড়া' আর 'ঋষিকুমার' দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি ভালো সে বিষয়ে সকলে একমত হওয়া গেল না। " আনন্দবাজারের আনন্দমেলায় ধারাবাহিক বেরোবার পর অনেকের অনেক চিঠি পেয়েছি, কিন্তু শঙ্খ ঘোষের চিঠি পেলে বুঝতে পারা যায় যে এই লেখাটা তাহলে কোথাও হয়তো কিছু হয়েছে। এখন, এটা শিশুসাহিত্য না কিশোরসাহিত্য সেটা আমার ভাববার বিষয়ই নয়। লেখার সময় তো ওরকম ভেবে লেখে না কেউ কিছু।

শিশুসাহিত্যের প্রকৃত অর্থে 'শিশুসাহিত্য' হয়ে ওঠার জন্য, অর্থাৎ আপনার ভাষায় ছোটদের 'দুধের বদলে পিটুলিগোলা' যাতে না খাওয়াতে হয়, তার জন্য কোন্ কোন্ দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত?

সেটা লেখকই বুঝতে পারবেন।

আপনি নিজে তেমন কিছু ভাবেন না লেখবার সময়ে?

না না, একেবারেই ভাবি না।

তাহলে 'পিটুলিগোলা' এই শব্দটি কিছু লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন কী দেখে?

যেমন, একজন লেখককে দেখেছি, 'ছেলেবেলায়' লিখত, খালি সব লেখাতেই 'ওমা' এই শব্দটা আগে বসিয়ে দিত। 'ওমা সূর্য এরকম লাল বুঝি', 'ওমা আকাশে কেমন রাত্রি নামল দেখেছো'... সবেতেই 'ওমা'। আমি একদিন বললাম তাকে, সবেতেই ওরকম ওমা ওমা করো কেন? তুমি কি ছেলেদের পিটুলিগোলা গেলাচ্ছো? আবার, আরেকজন বিখ্যাত লেখক, তার নাম বলব না। চিরজীবন শিশুদের সাহিত্য নিয়েই ছিলেন। লিখেছেন, আমরাও ছোট বয়সে পড়েছি। খুবই বিখ্যাত লেখক, কিন্তু আমার তাঁর লেখা ভাল লাগত না। কেননা, কোনো বিদেশি পটভূমিতে বোনা কাহিনিতে স্থানীয় ছেলেমেয়ের নাম, যা-হোক কিছু বানিয়ে দেওয়া, যে নাম আদৌ ওদের দেশে হয় না। সেই দেশের মরুভূমি বা তুষারাবৃত অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতাও নেই। মনে হয় এ যেন ছোটদের মনে 'ছেলেভুলানো ঝুমঝুমি'। অথচ তিনি খুবই নামী লেখক। একবার আমায় সাক্ষাতে বলেছিলেন, "আমাদের মধ্যে কেউ তো কখনো আন্টার্কটিকায় যায়নি, আপনি গেছেন। আপনার আন্টার্কটিকা অভিযানের দুঃসাহসিক রোমাঞ্চ নিয়ে একটা কিশোর-উপন্যাস লিখুন।" আমিও যথারীতি বলেছিলাম, লেখার সময় কোথায় পাই বলুন!
এর মধ্যে বার কতক বিদেশ গেছি, শীতের বরফের মধ্যেও যেতে হয়েছে। একবার ব্যস্ততার মধ্যে বিদেশে ছিলাম। আমার কাজের শেষে খবর পেয়ে আমার টেনেরিফ দ্বীপের শিল্পীবন্ধু ইসাবেলা, তখন মিউনিখের কাছে একটা গ্রামে থাকতেন, তাঁর মেয়ে ও মেয়ের বন্ধুকে পাঠিয়ে আমাকে আমার হোটেল থেকে তাঁর সেই গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে জানলা দিয়ে অস্ট্রিয়ান আল্পস দেখা যাচ্ছে। সারা দিন-রাত বরফ পড়ছে। ওই

ঘরে চার দিন না পাঁচ দিন ছিলাম, আমার ঘরের দেওয়ালজোড়া কাঁচের জানলা দিয়ে দেখছি সবসময় বরফ পড়েই চলেছে। ওইখানে বসে হঠাৎ বরফে ঢাকা আন্টার্কটিকা মনে পড়ে গেল। তখন 'বরফের বাগান' লিখতে শুরু করেছিলাম। তুমি তখন পাঠকের বয়স ভাগের কথা বলছিলে, কিশোর না শিশুসাহিত্য বোঝার প্রশ্নে, 'বরফের বাগান' কিন্তু কিশোরসাহিত্য। 'গরিলার চোখ'ও একেবারেই তাই। 'আমাজনের জঙ্গলে' নিয়ে আমি একটু দ্বিধায় থাকি। এটা পাঁচ বছর না হোক, সাত-আট থেকে যেকোনো বয়সের ছেলে মেয়ে পড়তে পারে। এখন তো দেখি 'আমাজনের জঙ্গলের' একটা পরিচ্ছেদ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পাঠ্য। আমার 'পাখির খাতা', 'তালগাছের ডোঙা', 'টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী', 'আমার বনবাস', 'জলবাতাসা' এরকম অল্প কয়েকটি বই ছাড়া ছোটদের সব লেখাই আট থেকে আশি বছরের সব 'ছোটদের' জন্যই লেখা। সেই যে এক পাঠকের চিঠির কথা বললাম, দুই মুগ্ধ পাঠকের একজনের বয়স আট, আরেকজনের আশি।

কিছু লেখা আসলে তাৎক্ষণিক বিনোদন দেয় বা পাঠকের সাময়িক তৃপ্তি ঘটায়। লেখা তো নানাধরনেরই হবে। যেমন, অ্যাডভেঞ্চার, হাসির, থ্রিলার ইত্যাদি। তবে, আমার মনে একটা প্রশ্ন ওঠেই, সব লেখাই কি ছোটদের মনের জাগরণ ঘটায়? আনন্দের দিকে, শুভের দিকে, ন্যায়ের দিকে, নতুন স্বপ্নের দিকে, সাহসের দিকে? হাল আমলের ছোটদের জন্য অনেক লেখাই কল্পনাহীনভাবে আজগুবি। সেখানে বাস্তবতার মধ্যে লেখকের প্রবল দেশকালবোধ এবং কল্পনার হরগৌরী মিলন ঘটে না। আর আমার কাছে শিশু বলতে কী জানো তো? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা শিশু আছে। সে যে বয়সেরই হোক না কেন। আমি আসলে তাদের জন্য লিখি। আমার নিজের মধ্যেও সেই শিশুটিই আমার নিঃসঙ্গের সঙ্গ। আট থেকে আশি যেকোনো বয়সের শিশুদের জন্যই তাই আমি লিখি। তবে যে আখ্যান ঘটনা বা বিষয়ের দিক থেকে পাঁচ-ছয়-সাত বছরের শিশুর নাগালের বাইরে, সেগুলোকে চালু নিয়মমতো শিশুসাহিত্য না বলে কিশোরসাহিত্য বলাই বোধহয় ভালো।

মানে একটু পরিণত বয়সের জন্য লেখা?

তাই। জুভেনাইল লিটারেচর। কিন্তু চিলড্রেনস লিটারেচর বলে যেমন সবকিছুই তার ভেতর ধরিয়ে দেওয়া হয়, সেটা ঠিক না।

আপনার ছোটবেলা, নিজের শৈশব-কৈশোর, বারুইপুরে বেড়ে ওঠা থেকে বিশ্বভ্রমণের তাড়নায় বাড়ি থেকে পালানো; এই যে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, এটি আপনার শিশুসাহিত্য রচনার কলমকে কতটা সহায়তা করেছে?

সাহায্য করে কিনা কী করে বলবো? এটা আমার জীবন। লেখক না হলেও আমি এরকমই তো করতাম।

না, ওই যে গৌরের বেরিয়ে পড়া, আপনিও তো সেই ছেলেবেলায় ওরকমই একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন।

তখন আমি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। একদিন মধ্যরাতে বারুইপুর থেকে ডায়মন্ড হারবার লোকালে চড়ে বসলাম। পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় শেষ রাত। ডায়মন্ড হারবার থেকে বাসে কাকদ্বীপ, সেখান থেকে আরেকটা বাসে চড়ে ভোরবেলা নেমেছিলাম নামখানায়। সামনেই হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী, আর নদী পেরলেই বকখালি। ইচ্ছে ছিল বকখালি থেকে বিদেশগামী জাহাজে চড়ে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর, অতলান্তিক মহাসাগর,

প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে গোটা পৃথিবীটা ঘুরে দেখব। কিন্তু নামখানার সেচ বিভাগের বাংলোর মালী-কাম-কেয়ারটেকার আমার সে ইচ্ছা বাস্তব করতে দিলেন না। কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলে আমি তাঁকে বলেছিলাম, নদী পেরিয়ে বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ গিয়ে বঙ্গোপসাগরে ভাসা বিদেশগামী জাহাজে চড়ব। তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন, খানিকক্ষণ বাংলোয় বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে তারপর যেতে। সেইমত তাঁরই আনা খাবার খেয়ে মোটা গদির বিছানায় শুয়ে পড়ি; ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে দেখি সন্ধ্যে। মালী বললেন, বকখালির ওদিকে ডাকাতের আখড়া আছে, জায়গাটা নিরাপদ নয়, আমার আজ বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো, পরে একদিন দিনের আলোয় নদী পেরিয়ে বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ থেকে জাহাজে উঠতে। বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে আসি।

সেইসব অভিজ্ঞতা কি আপনার শিশু-কিশোরসাহিত্যে ছায়া ফেলে না?

জানি না। কী থেকে যে কী হয় সেটা ঠিক বলতে পারব না।

লেখার সময় কি ওই স্মৃতিগুলো ভিড় করে আসে?

না, ওভাবে আসে না। আমার জীবনটা ওরকম বলে, আমার মনটা ওরকম বলে, লেখাও ওই রকম। আমার মনের মধ্যে যে দয়া-মায়া, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন, সাহস, নানা আলোড়ন, যেসব প্রবণতা, সেগুলোই লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে হয়ত। তবে 'ঋষিকুমারে' যেসব ঘটনা আছে, তার অধিকাংশই আমার নিজের জীবনের গল্প। ওই পাহাড় তৈরি করা...

চিড়িয়াখানাটা?

হ্যাঁ, ওটাও। আমি তো চাষীদের বাড়িতে যেতাম, খড়ের চালার বাঁশের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা বাদুড় বা চামচিকের ছানা যত্ন করে এনে আমার ছাদের চিড়িয়াখানায় রাখতাম। শালিখও। চোখ না-ফোটা ইঁদুরছানাও পুষেছি। অনেক বর্ষায় জলে টইটম্বুর পুকুরে পাশের বাগানের জরাজীর্ণ পাঁচিলে ইঁটের খাঁজে হাত ঢুকিয়ে দেখতাম কিছু পাওয়া যায় কিনা। মাছ টাছ হয়তো লুকিয়ে আছে ভেবে একদিন হাত ঢুকিয়ে দেখি নরম কী একটা হাতে লেগেছে; ব্যাঙ ভেবে টেনে বার করতে গিয়েছি, ফোঁস করে উঠেছে। সে তো আর পোষা গেল না। বাঁশিওয়ালার সঙ্গে চলে যাওয়াটা পর্যন্ত সত্যি। তবে আমি কিন্তু কবে কী করেছিলাম ভেবে ভেবে 'ঋষিকুমার' গল্পে সেই স্মৃতিকথা লিখিনি। লেখার মধ্যে এসে গেছে। পাহাড় টাহাড় বানানো এসবই আমি করেছি। কিন্তু সেগুলো কখনোই এজন্য নয় যে পরে লিখতে আমার কাজে লাগবে। বুঝেছো নিশ্চয়ই? ধরো 'ভ্রমণ' পত্রিকার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তুমি যদি কোথাও যাও, সে তুমি লেখবার জন্য দেখামাত্রই নোট করবে। আমার জীবনটা আমি ওরকম লেখবার জন্য নোট করিনি। আমার জীবন যেমন, লেখাও সেরকম।

শিশুসাহিত্য নির্মাণে একটা সময়-সমাজ বা পরিপার্শ্বের কতখানি প্রভাব থাকে বলে আপনি মনে করেন?

খুবই থাকে। কারণ, ওই যে আমি পিটুলিগোলার কথা বলেছি না, ওই জাতীয় লেখাতে এসব জিনিস থাকে না। কিন্তু আমার মতে, অনেক জিনিস যেগুলো আমাদের আঘাত করে, ব্যথা দেয়; সমাজের বিভিন্ন আচার আচরণ; সেগুলো ছোটদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে নেই। আবার সমস্তটা পন্ডিতের মত করে তাকে বোঝানোরও দরকার নেই। লেখার মধ্যে দিয়ে সেটা যদি এসে যায় তো ভালো। আমার লেখায় যেমন সেটা আসে। তুমি 'শাদা ঘোড়া'র কথাই যদি বলো; 'শাদা ঘোড়া'য় তো মানুষের দুঃখ-বেদনা, জমিদার-জোতদারের অত্যাচার, 'গৌর যাযাবরে'-ও এমন অনেকের কথা আছে যারা মানুষের ভালো দেখতে পারে না, ফলে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ছোট ছেলেমেয়েদের মন দেখবে এসবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সে মনে মনে 'শাদা ঘোড়া'র বিজু রাখাল হয়ে যায়, সেও লড়াই করে, সেও ভাবে রাজাকে শাস্তি দিতেই হবে, কেন সে জোর করে আমার ঘোড়া কেড়ে নিয়েছে? 'হীরু ডাকাতে'ও দেখো তাই। কার ভাত নেই, পরনে শাড়ি নেই, কার কত দুঃখ... 'সবই দেখেন সবই শোনেন, সব মানুষের দুঃখ গোনেন'... এটা একজন কবিকেই সাজে। যিনি লেখেন, হীরু ডাকাতের মতোই তাঁর মন হয়। সেরকম মন না হলে লেখা যায় না। যা কিছু সমাজে অমানবিক, যা বেদনা দেয়, সেসব ছোটদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে কেন? লুকিয়ে রাখা তো উচিত নয়। 'গৌর যাযাবরে' দেখবে তুমি। লেখাতে কল্পনা থাকবে, কিন্তু তার মজ্জায় থাকবে বাস্তব, সমসাময়িকতা।

হ্যাঁ, নিধের কথাই যেমন। কেন সে আর তার দাদা পকেটমার হল। পুরো কবিয়াল সংস্কৃতিটাই নষ্ট হয়ে গেল।

ঠিক। পেটে ভাত জোটে না তাদের। তাই গানের কথা শুনলেই পিত্তি জ্বলে যায়। গানের জন্য জীবনে অনেক দাম দিতে হয়েছে তাদের। সবাই তো এরকমই।

সমালোচক শামসুজ্জামান খান তাঁর একটি লেখায় লিখেছেন যে আপনার কলম শিশুদের জন্য লেখায় সর্বদা আদর্শবাদ ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়। এই অভিমত কি আপনি মানেন? যদি মানেন, তাহলে এটি কি সচেতনভাবে নেওয়া কোনো পদক্ষেপ? নাকি স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখার প্রয়োজনেই এসে যায় এই পক্ষপাত?

আচ্ছা, মানুষের কথা ভাবো তো, কোনো স্বার্থসর্বস্ব লোকের কথা বলছি না, এমনিতে কোনো ভালো লোকের কথা ভাবো তো যে আদর্শ বা ন্যায়ের দিকে ঝুঁকবে না।

যাঁরা কলম ধরেন, তাঁদের ক্ষেত্রে তো আরোই প্রযোজ্য কথাটা।

হতেই হবে।

তাহলে কি শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধু গল্প পরিবেশনই নয়, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যও থাকা উচিত বলে আপনার মনে হয়?

একেবারেই নয়। শিক্ষাদানটা কিরকম করে থাকবে জানো তো; তুমি তাকে তার ভাষায় গল্প শোনাচ্ছো, কবিতা পড়াচ্ছো, তার পুরো মনটাকে তুমি আনন্দের সঙ্গ দিচ্ছো, এর মধ্যে দিয়ে সে তার নিজের মত করে শিখে

নিচ্ছে। ছোটদের মনে সাহস, স্বপ্ন, কল্পনা, মানবিক মূল্যবোধ দিতে হবে। তার মনকে জাগাতে হবে লেখার মধ্যে দিয়ে। এ অনেকটা 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা নামে'। শিশিরের কি শব্দ হয়? হয় না। অথচ সন্ধ্যাটা এমন করে নামছে, আস্তে-ধীরে সন্তর্পণে, যেন শিশিরের শব্দের মত। তেমনি শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টা। কেউ যদি ভাবে আমি এই ন্যায়ের কথাটা শেখাব বলে লেখাটা লিখছি, তাহলে সে লেখাটা লেখাই হয় না।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা আসার, তা আসে।

আমি একটা লেখা লিখলাম, সেটা পড়ে সবাই আনন্দ পেল। তারপরেই বলল, "উঃ আজকে যদি একটা লাঠি পেতাম না, সেটা দিয়ে আমি সব পাখি মেরে বেড়াতাম", তাহলে বুঝতে হবে যে আমি লেখাটা লিখতেই পারিনি। শিশুসাহিত্যের ভেতরে দেশের যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা থেকে যায় অন্তঃশীল নদীর মতো।

এখন তো ছোটদের জীবনে তথ্যপ্রযুক্তি ভীষণভাবে প্রভাব ফেলছে। তাদের মানসিকতা থেকে লাইফস্টাইল অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। সেইরকম দিকগুলো, ছোটদের কম্পিউটার গেমস ঘাঁটা জীবন, আপনার লেখায় সেভাবে আসে না। আপনি এসময় দাঁড়িয়েও দুরুদুরুকে আনেন। প্রকৃতিসংলগ্ন হয়ে বেড়ে ওঠা ছোটদের জীবন তুলে ধরেন। এর কারণ কী?

প্রশ্ন করেছো বটে একটা। এগুলো, এই কম্পিউটার, মোবাইল এসব তো যুগের নিয়মেই আসে। টেকনোলজির দ্রুত বিকাশ তো থাকবেই। আমাদের জীবন প্রযুক্তিনির্ভর। এতে প্রমাণ এটাই হয় যে, অনেক সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি যেটা ছোটরা আগে আলো-বাতাসের মতোই পেত; তার যৌথ পরিবারের কাঠামো বা পাড়া কিংবা স্কুলের বন্ধু-বান্ধব থেকে, সেসব থেকে তারা হয়তো কিছুটা দূরে থাকছে। কিন্তু তার জন্য কারোর যদি অন্যভাবে মানুষের জীবনের কথা গল্পে বলতে ইচ্ছে হয়, তার সে ক্ষমতা থাকে বলার, তাহলে কি সে এই ভেবেই থেমে যাবে যে, না না, এখন তো ছোটরা কম্পিউটার গেমস করে? চারিদিকে কত শপিংমল গড়ে উঠছে, বহু ব্যবসায়ী জোর করে তাদের পণ্য বিক্রি করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। এখন, যে লোক বাঁশিতে তার প্রাণের সুর তুলতে পারে, সে কি তাহলে বাঁশি বাজানো ছেড়ে দেবে? বাঁশি বাজালে তার কি কোনো শ্রোতা হবে না? এরকম নয় যে একদিকে একটা প্রবণতা ভারী হলে তার বিপরীত দিকটা শূন্য হয়ে যায়। তা যদি হত, তাহলে তো অ্যান্ডারসনের অনেক বই আমরা এখন পড়তামই না। আরো অনেক এরকম বইয়ের কথা বলা যায়। কিন্তু পড়ি কেন? এজন্যই পড়ি কারণ মানুষের মনটা ঠিক আইনের আদালত নয়, যে, একজন দোষী আর অন্যজন নির্দোষ। বা একটা রাজনৈতিক দলের সভা নয় যে, আমার যা-কিছু সব ভালো আর অন্যের যা-কিছু সব খারাপ। মানুষের জীবনটা এরকম তো নয়। সেখানে কারোর জীবনে কোনো আলো নিভে গিয়ে থাকতে পারে, কারোর পথের ভুল হতে পারে, কিন্তু জীবনের মূল আনন্দ-বেদনা নিভে যায় না। ধরো, কেউ বইতে পড়ছে একটি ছেলের মাকে সাপে কেটেছে, সে মরে গেছে, তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে; এটি পড়ে তার কি দুঃখ লাগবে না? সুতরাং, মানুষের মায়া-মমতা-বেদনা-ভয়-সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন সব মিলিয়ে যে জীবন, সেটা নিয়েই তো শিল্পী বা সাহিত্যিক কাজ করবেন। লিখবেন, ভাববেন।

কিন্তু 'ঋষিকুমারে' ঋষিকে যেভাবে দেখানো হচ্ছে, সেটা ২০২২-এর কোনো শিশু, শহরের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, গ্রামেও, এরকম একটা শৈশবের ধারণাই হয়তো করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তারা যখন এসব বই পড়বে, তারা কি ঋষির সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে?

যারা আগ্রহ পাবে না, তারা পড়বে না। হতেই পারে। লেখকের তো দায় নয় যে তার বই সবাইকে পড়াতে হবে। সতীনাথ ভাদুড়ীর বই কজন বাঙালি পাঠক পড়ে এখন? পড়ে না। তাহলে সতীনাথ কি মিথ্যে হয়ে গেলেন? শেক্সপীয়ার কজন ইংরেজ এখন পড়ে? আমি তো গ্রীসে দেখেছি, তারা হোমার-অ্যারিস্টটলের নামই জানে না। অবাক হয়ে গেছি। কিন্তু তাই বলে কি এগুলো মিথ্যা হয়ে গেল? সেরকম।
'The Western Intellectual Tradition' নামে একটা বই আছে, মানুষের ভাবনা-চিন্তার ইতিহাসের উপর। বইটা দুজনে মিলে লিখেছেন, ব্রনোস্কি আর ব্রুস ম্যাজলিশ। দুজনেই দুটো করে মোট চার ডিসিপ্লিনের পন্ডিত। অসাধারণ লেখা। মানুষের চিন্তাশীলতার ইতিহাস বিবর্তিত হতে হতে কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছে। এই যে ক্রীতদাসপ্রথা উঠে গেল, এতে 'আঙ্কল টমস কেবিনের' বিরাট প্রভাব। নীলবিদ্রোহের পেছনে 'নীলদর্পণ' নাটকের কম অনুপ্রেরণা নেই। মানুষের মনকে তার মানে ছোঁয়া যায় সাহিত্যের দ্বারা। আর মানুষের মনকে যত ছোঁয়া যাবে, ততই অশুভের বিরুদ্ধে শুভ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে নীতি এগুলো জাগতে থাকবে। একজন লেখক, শিল্পীর সেটাই কাজ। উসকে দেওয়া। তাঁদের বেদনাবোধ অনেক বেশি, বেদনা থেকেই তাঁরা লেখেন। তাঁদের আনন্দের বোধও অনেক গভীর, সেই আনন্দ থেকেই তাঁরা লেখেন। মানুষের মধ্যে যদি তুমি আনন্দ আর বেদনা দিতে পারো, তাহলে সে লেখায় তথ্যপ্রযুক্তিগত জীবনের কথা থাকল কি থাকল না, তাতে কিছু এসে গেল না। আর যারা পড়বে না, পড়বে না। এতে অভিভাবকদেরও দায় আছে। অনেক এমন অভিভাবক আছেন যাঁরা নিজেরা বই, বিশেষ করে ছোটদের বই, পড়ার চেষ্টাও করেন না। নিজেরা বই না পড়লে ছোটদের পড়তে বলবেন কিভাবে? এভাবে হয়তো একটা শ্রেণীবিভাগ হয়ে যায়। অনেক বছর আগে কোপেনহেগেনে একটা ইন্টারন্যাশনাল নিউজপেপারস কনফারেন্স হয়েছিল, আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। সেখানে এ.ই পোস্টম্যান বলে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া ইকোলজির অধ্যাপক বলেছিলেন, একটা নতুন ধরনের নিরক্ষরতা আসছে, 'A new kind of illiteracy emerges'। শব্দের মাধ্যমে যেসব কথা আমরা লিখি, মানুষের ব্রেনের একটা অংশ তাতে সাড়া দেয়।। কম্পিউটার যত প্রভাব ফেলবে ওই অংশটা তত ভোঁতা হয়ে যাবে। আমি দেশে ফিরে 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকায় বলেছিলাম, এ বিষয়ে লিখেছিলাম। পাঠকের কাছে আবেদন করেছিলাম, আপনার বাড়িতে যে কাজ করেন, দুধ দেন বা এখনও স্বাক্ষর নন, তাঁদের সপ্তাহে একদিন অন্তত অক্ষর চেনান। বর্ণপরিচয় শেখানো হয়ে গেলে বড় বড় হরফে কিছু লেখা পড়ান। কানাইলাল চক্রবর্তীর 'চলো দেখে আসি' বই থেকে প্রতি সপ্তাহে একটা করে অংশ ছাপাও হত। ছোটদের বই পড়ানোও বড়দের একটা বড় কাজ।

বেশ। আচ্ছা, কোনো একটি বিশেষ চরিত্রকে মুখ্য করে একটা সিরিজ নির্মাণ, ফেলুদা বা ঘনাদা জাতীয়, আপনি করেননি। কেন?

ভালো প্রশ্ন করেছো। দেখো, আমি আগে ভাবতাম, আমি যদি কখনো লেখক হই, যদি কোনো একটা বই লিখি, আর তা যদি অনেকে পড়ে বা জেনে যায়, তাহলে পরের বইটা অন্য নামে লিখব। যাতে পাঠক বুঝতে না পারে যে এই লোকই সেই লোক। আর ওই যে সিরিজের কথা বললে, প্রথম লেখা আমার 'শাদা ঘোড়া'; তার

গদ্য একরকম। ‘ঋষিকুমার’ও একই সময়ে লেখা। ‘শাদা ঘোড়া’র ভাষা রূপকথার, ‘ঋষিকুমারের’ আরেকরকম। ‘ঋষিকুমারের’ ভাষা প্রায় এখনকার গল্পের ভাষা। এর পরের বই ‘হীরু ডাকাত’ তো গদ্যেই লেখা নয়। পুরোটাই পদ্যে লেখা। Dialogue and Description, দুটোই ছন্দে লেখা। সুতরাং, যে তার নিজের নামে দুটো বই লিখতে চায় না, এবং যে একবার যে ভাষায় লিখেছে পরেরবার সেই একই ভাষায় লেখে না, সে একটা সিরিজ করার কথা ভাববে? আমি গৌর সিরিজ লিখে যাব পরপর? পারবো না লিখতে। সে ক্ষমতাই আমার নেই।

পুনরাবৃত্তি এসেছে, একটা ক্ষেত্রেই। ‘আমাজনের জঙ্গলে’তে যে অনুপলকে পাচ্ছি, ‘গরিলার চোখে’ও তাকে পাই। তখন সে আরেকটু বড় হয়েছে। কিন্তু দুটো কখনোই সিরিজ নয়।

হ্যাঁ, সেটা বলতে পারো। একটা গল্পের সঙ্গে যদিও আরেকটার সম্পর্ক নেই। একটায় সে পুরস্কার পেয়ে রিও ডি জেনেরোয় কাকার কাছে গিয়েছিল। কাকা লোভী ও অসৎ লোক। লোভী হলে অসৎ হতেই হবে। তা সেই কাকার সঙ্গে সে আমাজনের জঙ্গলে গেল। দুর্ঘটনাবশত জঙ্গলে আটকে গেল, গিয়ে আবিষ্কার করল আদিবাসী জীবনকে। আর পরেরটায় আফ্রিকার গরিলাদের যে রোমাঞ্চ, তার সঙ্গে জড়িয়ে গেল জাতিদাঙ্গার ইতিহাস। এটা আলাদা গল্প। ভৌগোলিকভাবে ভাবলেও রোয়ান্ডা হচ্ছে মধ্য আফ্রিকা। রেইন ফরেস্ট ওখানে রোয়ান্ডা, উগান্ডা আর ঘানা এই তিনটে দেশে ছড়ানো। আবার আমাজনের জঙ্গল সাতটা দেশে ছড়ানো। ৬৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। রোয়ান্ডা আর উগান্ডার জঙ্গলে আমি নিজে ঢুকি, ফলে ‘গরিলার চোখ’ লিখতে সুবিধা হয়। আমাজনের জঙ্গলে আমি সবটা যেতে পারিনি, সম্ভবও না। ওই গল্পটা লেখার কথা কিন্তু প্রথমে ভাবিনি। আমি গিয়েছিলাম একটা ইন্টারন্যাশনাল নিউজপেপার কনফারেন্সে রিও ডি জেনেরোতে। সেখানে পোস্ট কনফারেন্স ট্যুরে আমাজনের জঙ্গলে নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল। প্রথমে আমি রাজি না হওয়ায় সব জায়গা ভর্তি হয়ে যায়। পরে একজন ক্যানসেল করল, আমিও তখন জঙ্গলে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সেটা সম্ভব হল। তা ব্রাজিল থেকে ফেরার আগেই একটা দৈনিক পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যার প্রয়োজনে একটা উপন্যাস লিখে দেবার জন্যে খুব অনুরোধ করছিল। আমি আমার অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছিলাম। ফেরার পরও লেখাটার জন্য বারবার তাঁরা জোর করতে থাকলেন। তখন আমি ভাবলাম এতবার এঁরা জোর করছেন, তাহলে এই তো আমাজন ঘুরে এলাম, এটা নিয়েই কিছু একটা লেখা যাক।

সচরাচর জঙ্গলকে কেন্দ্র করে রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চারমূলক কিশোরসাহিত্য রচিত হয়। আপনি আমাদের নিয়ে গেলেন উবা তথা এক জনজাতির কাছে। বাস্তবে কি তেমন কোনো অভিজ্ঞতা আপনার ঘটেছিল?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিছুটা তো বটেই। তবে আরও গভীরে গেলে আরও বেশি দেখতে পেতাম। সে তাহলে একটা বছর থাকতে হয় ওখানে। তাছাড়া আমি তো উপন্যাস লিখছি, কল্পনায় অনেক কিছু পূরণ করে নেওয়া চলে। আবার ওই যে আছে হেলিকপ্টারের কথা, জঙ্গলের মাপজোক হচ্ছে, ওটা কিন্তু সত্যিই ঘটছে। জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, জঙ্গলের একটা অংশের কমার্শিয়াল ইউজের জন্য পার্লামেন্টে আইন পাস হয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিবাদপত্রে আমি স্বাক্ষরও করি। যে অংশটা কেটে ফেলা হবে সেটার আয়তন পর্তুগালের তিনগুণ হবে। এতে যে কত বড় সমস্যা হবে ইকোলজির; আমাজনের জঙ্গলকে বলা হয় ‘পৃথিবীর ফুসফুস’। তা এই গল্পে সেসবও আছে। লোক আসছে বাইরের, তারা এসব আদিবাসীদের বর্বর মনে করে।

মহাশ্বেতা দেবী বলতেন, "এই বইটা আমার টেবিলে থাকে সবসময়। যেদিন যেখান থেকে চোখে পড়ে, সেখান থেকে শেষ না করে ছাড়ি না। এই নিয়ে কতবার যে পড়া হয়ে গেল", তিনি দৈনিক কাগজে রিভিউও লিখেছিলেন তো এই বই নিয়ে। তো যাইহোক, এই উপন্যাস লিখব বলে তো আর আমাজনের জঙ্গলে যাইনি, এমনিই গেছিলাম। তবু লেখা হয়ে গেল। আসলে আমাকে চেপে না ধরলে লেখা হয় না। 'হীরু ডাকাতের' দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্বও সম্পাদকের তাগাদায় লেখা। 'গরিলার চোখ'ও তাই।

'বরফের বাগান' সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হয়, আন্টার্কটিকা ভ্রমণের সময় তেমন কোনো অভিজ্ঞতা কি হয়েছিল বাস্তবে? রহস্যে ঘেরা এক অজানা ভুবন...

বরফের নিচে ওই নীল আলোর প্রাচীন সভ্যতা? না, সেটা তো কল্পনা। তবে প্রাচীন গ্লেসিয়ারের খাঁজে নীল আলোর দ্যুতি কয়েক জায়গায় দেখেছি।

আপনার লেখায় বাঁশির একটা ভূমিকা ঘুরেফিরে আসে। বিজু বাঁশিতে সুর তোলে, হীরু ডাকাত দুঃখ হলে বাঁশি বাজায়, ঋষি বাঁশি চেয়ে কলম পায় ইত্যাদি। এটা নিয়ে কিছু বলুন।

বাঁশি আমি খুব ভালোবাসতাম। আমার নিজের একটা বাঁশি ছিল, বাজাতেও পারতাম। বাঁশিওয়ালা দেখেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতাম। এক বুড়ো বাঁশিওলাকে এত ভালোবেসে ফেললাম যে তার কাছে বাঁশির সুর শিখব বলে তার পিছু পিছু অনেকদূর চলে গেছিলাম। বাঁশি তো জীবনের কথারই সুরেলা প্রকাশ।

'হীরু ডাকাত' ওভাবে যে লিখবেন, চমকপ্রদ একটা নির্মাণ; ওভাবে ভাবলেন কেমন করে! যেটাকে আমরা নাট্যকাব্য বলতে পারি, আবার...

কাব্যনাট্যও বলতে পারো। এটা আসলে আমার মধ্যে অনেক কাল ছিল। বই লিখবো ভাবিনি। মানুষের এই দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে একটা লড়াই তো দরকার। আমি 'যুগান্তর পাততাড়ি'তে দিলু ডাকাত নামে একটা পদ্য লিখেছিলাম, যেটা পরে 'হীরু ডাকাতের' গান হয়। দিল আছে যার, সে দিলু। তখন 'হীরু ডাকাত' লেখবার কথা ভাবিনি। সেই সময় এদেশে যারা নকশাল, তারা তো শৌখিন রাজনীতি করার কথা ভাবছে না, পৃথিবীটা অন্যায় থেকে মুক্ত করবো ভাবছে; পরে এর মধ্যে বিচ্ছিরি মিশেল ঘটছে সে অন্য কথা। সেটাও ভেতর ভেতর আমাকে ভাবিয়েছিল। হীরুর গানটা দেখলেই বোঝা যায়। এভাবেই প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে একটা সময় লিখে ফেললাম। প্রথম পর্ব। দ্বিতীয়, তৃতীয় তাগাদায় লেখা। হীরুর ডাকাতির ধরণে কখনো হয়তো ফুটে উঠেছে ছেলেবেলায় মায়ের মুখে শোনা ভালো ডাকাতদের গল্প।

'পাখির খাতা' পড়তে গিয়ে মনে হয়, লেখক পাখিদের পর্যবেক্ষণে ভীষণ উৎসাহী। ওই বই লেখার সময় আলাদা করে পাখি নিয়ে কি পড়াশোনা করেছিলেন? খুব পাখি দেখতেন?

না না, পাখি নিয়ে বইটই পড়ে 'পাখির খাতা' লিখিনি। ভালোবাসি পাখি দেখতে। পাখির কথা শুনতে। এখনো কত পাখির কথা শুনি।

ওই বইটাও খুব অন্যরকম। হয়তো সেভাবে আলোচনায় আসে না

তাতে কী! লেখককে তার কাজ করে যেতে হবে।

আপনি তো বড়দের জন্যও লিখেছেন, ছোটদের জন্যও। লেখক অমরেন্দ্র বেশি তৃপ্তি পান কোন্ ক্ষেত্রে?

ঠিক বুঝতে পারি না। হয়তো ছোটদের জন্য লিখে বেশি আনন্দ পেয়েছি। আবার 'নিমফুলের মধু' বা 'দ্রৌপদীর থান'-এর গল্পগুলো লিখছি; যুগান্তর আজকালে ছাপা হচ্ছে; কিংবা 'বিষাদগাথা', 'জিপসি রাত' উপন্যাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে; সেগুলো লিখতেও নিশ্চয়ই ভালোই লেগেছে। ভালো লাগা মানে না লিখলেই নয়। না লিখে পারিনি তাই লিখতে হয়েছে। বাইরের তাগাদাও ছিল। আবার এমন অনেক লেখাও থাকে, যা না লিখলে নয় ভাবি কিন্তু, লেখা হয় না। তখন যদি কেউ আমায় চেপে ধরে বা তাগাদা দেয় লেখার জন্য, হয়তো সাময়িক তার প্রতি বিরক্ত হব, কিন্তু তারপরেও যদি সে লেগে থাকে, তাহলে সে লেখাটা হয়ে যায়। মজার ঘটনা বলি একটা তোমায়। কলকাতার এক নামী দৈনিকের রবিবারের বিভাগীয় সম্পাদক প্রায়ই গল্প লেখার তাগাদা দিতেন। নির্দিষ্ট তারিখে গল্প না শেষ করলে এই বলে ভয় দেখাতেন যে, "আমার শরীর খারাপ, সুগার প্রেশার সব চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে। আপনি যদি অমুক তারিখের মধ্যে গল্প লিখে না দেন, আমি আপনার দরজায় গিয়ে হত্যে দেব, আর আমার বুকে লেখা থাকবে আমার মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী।" মজা করেই বলতেন, কিন্তু ঠিক লিখিয়েও নিতেন।

তার মানে যখন যেটা লিখেছেন, সেটাই ভালো লেগেছে লিখতে।

আসলে যখন যা দেখি, এই যে বাইরে যাই, তখন তো সেটা ভাল লাগে। ভালো লাগার কোনো বাছবিচার হয় না। ভালো লাগাটা যদি তোমার মনে থাকে, ভাল লাগবে। তোমার মন যদি সজীব হয় খুব, সে ব্যথা পাবে, সুখী হবে, দুঃখী হবে, স্বপ্ন দেখবে, স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট পাবে। এসব নিয়েই আমাদের জীবন। তো লেখাটাও এরকমই। লেখক কী লেখেন? জীবনই তো। তাহলে কোন্‌টা লিখে বেশি আনন্দ পাই কী করে বলি! তেমন হলে তো বড়দের জন্য কিছু লিখতামই না।

শিশু-কিশোরসাহিত্য রচনায় কাদের লেখা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে?

অনুপ্রেরণা? কারোর কোনো লেখা পড়েই কখনো লেখার কথা ভাবিনি। আমি সুকুমার রায়ের লেখা পড়ে মুগ্ধ, অবন ঠাকুরের লেখায় মুগ্ধ, আরও দীর্ঘ করা যায় এই তালিকা। বিদেশি অজস্র ভালো ভালো বই পড়েছি। সেটা আমার নিজের মনের খিদেয়। শিশু বা কিশোরসাহিত্যের চেয়ে হাজার গুণ বেশি পড়েছি বিদেশি সাহিত্য। তা থেকে যে আমার নিজেকে লিখতে হবে, এমন মনে হয়নি। আমার প্রেরণা তাড়না সব একটাই -- আমার নিজের মন। মনটাই আমাকে লিখিয়ে নিতে চায়। শুধু ভীষণ কর্মব্যস্ততার জন্য যতটা লিখতে চেয়েছি, ততটা লিখিনি।

সাম্প্রতিক কোনো শিশুসাহিত্যিকের কথা বলুন, যাঁর লেখা আপনার বেশ ভালো লাগে।

শীর্ষেন্দুর বহু লেখা অনেকদিন ভালো লেগেছে। বলরাম বসাক, নিজস্ব একটা ভাষা আছে। শঙ্খবাবুর ছোটদের জন্য লেখা। সরল দে। সুনীলদার কিছু লেখা। এভাবে কী আর বলব? নিজেরাই খুঁজে নাও এর উত্তর।

গোটা বিশ্বের নিরিখে অনুবাদের ভিত্তিতেই হোক, বা মৌলিকভাবে, বাংলা শিশুসাহিত্যের অবস্থান এই মুহূর্তে ঠিক কোথায়?

এই মুহূর্তে? বলা মুশকিল। তবে বাংলা শিশুসাহিত্য বহুকাল থেকেই বিশ্বমানের।

শেষ প্রশ্ন। নতুন যাঁরা ছোটদের জন্য লিখতে কলম ধরেছেন বা ধরবেন বলে ভাবছেন, তাঁদের উদ্দেশে অভিভাবকসুলভ কোনো পরামর্শ দেবেন?

না না, এ আমি বলতে পারি না। যাঁরা লিখবেন, তাঁরা নিজেই নিজেদের পথ খুঁজবেন। পথ কি কারো একার? না পথ বলে দেবার? পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়।

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি সুস্থ থাকুন, দীর্ঘজীবী হোক আপনার কলম। ভালো থাকবেন।

সেলিমপুর, কলকাতা
২১.০১.২০২২
সাক্ষাৎকার গ্রহণে : শতাক্ষী কুন্ডু